সমাজ রূপান্তর ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় মুদ্রণ সংস্কৃতির প্রভাব

মিজানুর রহমান খান*[1]

সারসংক্ষেপ

১৭৫৭ সালে বাংলায় উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। এরই ফলে সমাজের স্বাভাবিক ও চলমান স্বতস্ফূর্ত ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে শুরু করে। শাসকদের অভিরুচিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা ও মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক কাঠামো আধিপত্য বিস্তার শুরু করে ভাষা ও সাহিত্যের উপর। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শাসকরা তাদের সুবিধার্থে প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় ভাষার পরিবর্তনমুখী নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে। এই পরিবর্তন স্থায়ী ও সচিত্র রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রণ-যন্ত্রই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে ওঠে। মুদ্রণ-যন্ত্রকে ব্যবহার করে ঔপনিবেশিক শাসকরা তখন ভাষার প্রমিতকরণের নাম দিয়ে একটি আদর্শ মান নির্ধারণ করতে চায়, যে ভাষা মূলত সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারা তৈরি হওয়া সংস্কৃত শব্দ নির্ভর বাংলা ভাষা এবং যে ভাষার সাথে মৌখিক ভাষার পার্থক্য ছিল। পরবর্তীকালে তাদের এই কৃত্রিম ভাষা সর্বত্র প্রচলনের জন্য রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রচেষ্টা বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাপ্রাপ্ত করে। ভাষিক এই পরিবর্তন বাংলার সমাজ পরিবর্তন ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায়ও নতুন ভাবনার জন্ম দেয়। এবং ভারতবর্ষের সমাজ রূপান্তর ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় মুদ্রণ-যন্ত্র, তথা ছাপাখানার আবির্ভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। অর্থাৎ বর্তমান গবেষনায়, এই অঞ্চলে কীভাবে ভাষা, সাহিত্য ও চিন্তা একটি যন্ত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে সেটার স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: মুদ্রণ যন্ত্র, উপনিবেশ, মুদ্রণ সংস্কৃতি, সমাজ রূপান্তর, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা

ভূমিকা

১৫ শতকে মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার সমাজে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে বিশেষত সমাজের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধবৃত্তিক জ্ঞান চর্চায়। যুগান্তকারী এই আবিষ্কার তথ্যের প্রবাহ বৃদ্ধি, বুদ্ধবৃত্তিক চর্চার এবং সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার ব্যাপকতা নির্দেশ করে। এই উৎকর্ষতা শুধু ইউরোপ কেন্দ্রিক ছিল তা নয়, সেটা ভারতবর্ষের সমাজ রূপান্তর ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায়ও সমান প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু ভারতবর্ষে মুদ্রণ যন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের শাসনামলে, তাই শাসকদের অভিরুচি অনুযায়ী ছাপাখানাকে ব্যবহার করে সমাজের স্বাভাবিক ও চলমান স্বতস্ফূর্ত ভাষা ও সাহিত্যের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এবং তারা মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশ তৈরির লক্ষ্যে আধিপত্য বিস্তার শুরু করে ভাষা ও সাহিত্যের উপর। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শাসকরা তাদের সুবিধার্থে প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় ভাষার পরিবর্তনমুখী নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে। এই পরিবর্তন স্থায়ী ও সচিত্র রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রণ-যন্ত্রই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে ওঠে। মুদ্রণ-যন্ত্রকে ব্যবহার করে ঔপনিবেশিক শাসকরা তখন ভাষার প্রমিতকরণের নাম দিয়ে একটি আদর্শ মান নির্ধারণ করতে চায়, যে ভাষা মূলত সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারা তৈরি হওয়া সংস্কৃত শব্দ নির্ভর বাংলা ভাষা এবং যে ভাষার সাথে মৌখিক ভাষার পার্থক্য ছিল। পরবর্তীকালে তাদের এই কৃত্রিম ভাষা সর্বত্র প্রচলনের জন্য রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রচেষ্টা বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাপ্রাপ্ত করে। ভাষিক এই পরিবর্তন বাংলার সমাজ পরিবর্তন ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায়ও নতুন ভাবনার জন্ম দেয়। অর্থাৎ মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহার করে ব্যাপক সংখ্যক বই উৎপাদন, ঔপনিবেশিক শাসকদের শিক্ষার প্রসার, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনার পুন-নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। গুনগত গবেষণা হিসেবে এখানে মূলত ডিসকোর্স এনালাইসিস ও ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান গবেষনাটি এই অঞ্চলে কীভাবে ভাষা, সাহিত্য ও চিন্তা একটি যন্ত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে সেটার স্বরূপ অনুসন্ধান করবে।

---

[1] *মিজানুর রহমান খান, সিনিয়র লেকচারার, বাংলা বিভাগ, উত্তরা ইউরিভার্সিটি

মুদ্রণ যন্ত্রের আগমন, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব

মুদ্রণ-যন্ত্র তথা ছাপাখানা উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও রাজনীতির পালাবদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পালাবদলের হাতিয়ার হিসেবে ঔপনিবেশিক শাসকরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেকে বেছে নেয়। এর যাত্রা শুরু হয়, ১৭৭৯ সালের দিকে হুগলিতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই । এবং এ অঞ্চলে প্রথম মুদ্রিত বইয়ের সাথে পরিচয় ঘটে তখনই। এই ছাপাখানাটি ছিল মি. অ্যানড্রুজ সাহেবের। অ্যানড্রুজ সাহেবের সহযোগী হিসেবে যারা ছিলেন তারা হলেন চার্লস উইলকিন্স, জোসেফ শেফার্ড ও পঞ্চানন কর্মকার। এই কয়েকজন মানুষ এ অঞ্চলে ছাপাখানার বিস্তার ও বাংলা হরফ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড'র ব্যাকরণ বই দিয়েই তাদের এ যাত্রা শুরু হয়। এই ব্যাকরণ বইয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন উইলকিন্স ও বাঙালি কারিগর পঞ্চানন কর্মকার এবং আরেকজন খোদাইশিল্পী জোসেফ শেফার্ড। চার্লস উইলকিন্স ১৭৮১ সালে কলকাতার 'অনারেবল কোম্পানিজ প্রেস'-এর পরিচালক হন এবং এ ছাপাখানাটিই অষ্টাদশ শতকের কলকাতার অন্যতম প্রধান ছাপাখানা ও সক্রিয় ছাপাখানা হিসেবে পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ শতকে মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা ৬৫০, এর মধ্যে ৩১৬ টি বই ই ছাপা হয় অনারেবল কোম্পানিজ প্রেসে। এবং এই প্রেসে শুধু বাংলা নয়, দেবনাগরি ও উর্দুও ছাপা হতো। এই প্রেসটি ছিল ব্যবসায়িকভাবে সফল। ১৭৯২ সালে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ উইলিয়াম জোনস্ অনুবাদ করেন কালিদাসের *ঋতুসংহার*। এই ছাপাখানা থেকেই বইটি বের হয় এবং *ঋতুসংহার* বইটি দিয়েই সংস্কৃত সাহিত্য মুদ্রণ-যুগে প্রবেশ করে। (শ্রীপান্থ, ১৯৯৬: ৮-১০)। যদিও কলকাতার কোম্পানির ছাপাখানাটি সগৌরবে ও দাপুটে ছিল কিন্তু প্রথম ছাপাখানাটি ছিল সাংবাদিক জেমস অগাস্টাস হিকির। হিকির সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক ভালো ছিল না বলে মুদ্রাকর ও ব্যবসায়ী হিসেবে বেশিদিন তিনি টিকতে পারেননি। তবে ১৭৮০ সালে রাধাবাজার থেকে প্রকাশ করেন শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের নয়, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম সংবাদপত্র সাপ্তাহিক *হিকি'স বেঙ্গল গেজেট* বা *ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার*।

জেমস অগাস্টাস হিকি'র গুরুত্ব এ অঞ্চলে ব্যাপক। কলকাতা অঞ্চলে ছাপাখানার প্রসারে ও মুদ্রাকর হিসেবে তার সুনাম ছিল বেশ। তিনি এ অঞ্চলে প্রথম ও প্রথম শ্রেণির মুদ্রাকর ছিলেন। ১৮০০ সালের মধ্যে কলকাতার ১০টির মতো ছাপাখানা শুরু হয়, এইসব ছাপাখানার পরিচালকদের অধিকাংশেরই হাতেখড়ি ঘটে হিকির কাছে। ১৮০০ সালের দিকে কলকাতার মুদ্রাকরের সংখ্যা ছিল ৪০, তাদের প্রায় সবারই হিকির সাথে কাজের অভিজ্ঞতা ছিল।

ছাপাখানাগুলোতে অন্যান্য ভাষার বইয়ের সাথে সাথে বাংলা ভাষারও বই বের হয়। তবে সেটা তুলনামূলকভাবে খুবই কম। ১৫৫৬ সাল থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে যত বই ছাপা হয়েছে তার মধ্যে বাংলা বই বা মুদ্রিত বাংলা হরফের ব্যবহার দেখা গেছে মাত্র ৮৪টি ক্ষেত্রে। তবে বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ প্রথম বইটি হল জোনাথান ডানকান অনূদিত একটি আইনের বই। ১৭৮৪ সালে প্রকাশিত এ বইটির নাম *মপসল দেওয়ানি আদালত ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলা হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম*। প্রশাসনিক কাজ-কর্ম চালানোর জন্য সাহেবদের কাছে তখন জরুরি ছিল আইনের অনুবাদ এবং দেশীয় ভাষা জানার জন্য ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দকোষ ইত্যাদি। ১৭৯৩ সালে ক্রনিকল প্রেস থেকে বের হয় ফস্টারের *অ্যা ভোকাবুলারি ইন টু পার্টস, ইংলিশ অ্যান্ড ব্যাঙ্গালি অ্যান্ড ভাইস ভার্সা*। বইটি ছাপা হয়েছিল ফেরিস কোম্পানির ছাপাখানায়। ঐ সময়টায় অভিধান ও ব্যাকরণ বইয়ের বিশেষ কদর ছিল। কেননা বিদেশি শাসকদের যেমন এ অঞ্চলের মানুষদের ভাষা ও সংস্কৃতি বোঝা জরুরি ছিল, তেমনি ঠিক একই কারণে তাদের ভাষা জানাও এ অঞ্চলের মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল । আর পরস্পর জানার ও ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে এই বইগুলো সম্বল ছিল। ঐ সময় চোখ বুজে কিছু ইংরেজি শব্দ আওড়াতে পারলেই ভাষাবিদের তকমা পাওয়া যেত। (শ্রীপান্থ, ১৯৯৬: ১৪)। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮০০ সালে। ঐ বছরই প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতার ওয়েলেসলির উদ্যোগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, এ দুইয়ে মিলে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে গদ্যের যে বিকাশ ঘটে, তার প্রভাব আমাদের সমাজে কী রকম ও তার রাজনৈতিক প্রতিফলন আমাদের সমাজে কী রূপে বিকাশ লাভ করে, তা এই প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১৮৩৭ সালে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা সরকারিভাবে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সে বছরই ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের সঙ্গে মিলে তৈরি হয় শ্রীরামপুরের ঐতিহাসিক ছাপাখানা। খ্রিস্টীয় ধর্ম বিষয়ক বইকেই শুধু নয়, পাণ্ডুলিপি থেকে রামায়ণ ও মহাভারতকেও মুক্তি দিয়েছেন। তবে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা সগৌরবে বিস্তার সম্ভব হয়েছিল পঞ্চানন কর্মকারকে ঘিরে। হরফ বানানোতে পঞ্চানন এতই পটু ছিলেন যে, ইংরেজদের মাঝে প্রতিযোগিতা শুরু হল তাকে নিয়ে। পঞ্চানন কর্মকারকে নিয়ে একচ্ছত্র অধিকার বহাল থাকবে না, তাকে ছাড়া কারো কাজ চলবে না, তাই শ্লোগান হলো, 'ব্যবসায়ে মনোপলি চলবে না'। পঞ্চানন কর্মকারের মৃত্যুর পর তার কাজের ধারা টিকিয়ে রাখল জামাতা মনোহর। মনোহর ছিল তার যোগ্য শিষ্য। এই শ্রীরামপুর থেকেই ১৮১৮ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত হয় বাংলার মাসিকপত্র দ্বিভাষিক কাগজ *দিগদর্শন*। হ্যালহেডের বইয়ে যে বাংলা হরফ ছিল তা হুগলি নিবাসী জনৈক খুশমঙ মুন্সীর হস্তলিপি। পরে যখন মিশনারিরা কাজ শুরু করে, আদর্শ হস্তলিপি হিসেবে গৃহীত হয় জনৈক কালীকুমার রায়ের লিপি।

মুদ্রণ-যন্ত্রের ইতিহাসের অগ্রগতির সাথে সাথে কিছু প্রযুক্তিগত পদ্ধতি জড়িত আছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মুভেবল টাইপ (Movable type)। মুভেবল টাইপ হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা দিয়ে একটি তথ্য পুনরুৎপাদন করা যায় কাগজের মাধ্যমে। মুভেবল টাইপ এর আবিষ্কারের পূর্বে ছাপাখানার কাজ চলত 'উড ব্লক প্রিন্টিং' পদ্ধতিতে। যা আসলে অনেকবেশি সময় ও কষ্টসাধ্য ছিল।

পৃথিবীতে প্রথম মুভেবল টাইপ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বই তৈরি হয়েছে প্রাচীন চিনে ১০৪০ সালের দিকে, আর এই যন্ত্র তৈরি করেছিলেন 'হান চাইনিজ' এবং আবিষ্কার করেছিলেন 'বি শেং' (৯৯০-১০৫১) এবং এই প্রযুক্তি ব্যবহার করেই প্রতিবছর প্রাচীন চিনে হাজার হাজার বই প্রকাশিত হতো। এই বইগুলোর মধ্যে অধিকাংশ বই ছিল আইন ও চিকিৎসা বিদ্যার। যন্ত্রটির প্রসার ঘটেছিল চিনসহ পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে। সেই সময়ে ইউরোপের ব্যবসায়ী ও খ্রিস্টান মিশনারিরা যারা চিনে কাজ করতো তারাও এই যন্ত্র নিজ দেশে নিয়ে গেল। কিন্তু সমস্যা হলো হান চাইনিজ মুভেবল টাইপ যন্ত্রটি ছিল অনেক ব্যয়বহুল এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণে শ্রমিক লাগত এবং প্রায় হাজার খানেক মেটাল ও সিরামিক ট্যাবলেট লাগত যা 'এনশিয়েন্ট চাইনিজ রাইটিং' অনুযায়ী ১০০০০০ স্বতন্ত্র ট্যাবলেট লাগে, যেখানে ইউরোপের বর্ণমালা মাত্র ২৪/২৬ টি। সেক্ষেত্রে জোহানেস গুটেনবার্গ ১৪৫০ সালে একটি স্বতন্ত্র মুভেবল প্রিন্টিং প্রেস তৈরি করেন, যা আসলে ইউরোপের ছাপাখানার ইতিহাসের আমূল বদলে দেয়। এবং কম মূল্যের কিন্তু মান সম্পন্ন। ১৪৫৫ সালে গুটেনবার্গ বাইবেল মুভেবল টাইপ প্রিন্টিং প্রেস-কে ভালোমতোই ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়, পরবর্তী কালে যা ইউরোপের রেনেসাঁসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জোহানেস গুটেনবার্গ একজন জার্মান স্বর্ণকার ছিলেন। তিনিই প্রথম ইউরোপে এর প্রচলন করান। গুটেনবার্গ মূলত সুপরিচিত ছিলেন 'কাটিং পানচেস' ব্যবহার করে বিভিন্ন মুদ্রা ও বিভিন্ন আকারের ছাঁচ তৈরি করাতে। তিনি ১৪৩৬-১৪৫০ সালের মধ্যে ইংরেজি বর্ণমালাকে ম্যাট্রিক্স আকারে সাজাতে সক্ষম হন 'হ্যান্ড মুভ' প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এই আবিষ্কারের সূত্র ধরেই পরবর্তীতে ইউরোপ জুড়ে প্রিন্টিং প্রেস'র টেকসই যাত্রা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা অঞ্চলে মুদ্রণ-যন্ত্র আনা হয় এবং এর ব্যবহার শুরু হয়। যা পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আমূল পরিবর্তন করে দেয়। (ফজলে রাব্বি, ১৯৭৭: ৪-১৩)। সভ্যতার পরিবর্তন ও বিকাশে যন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। নগরায়নের পূর্বশর্তই ছিল যন্ত্র সভ্যতার বিকাশ। মানুষের জীবনের গতি পরিবর্তন করে দিয়েছে যন্ত্রের ব্যবহার। যেমন গাড়ি, আবিষ্কারের পর মানুষের সময়ের ধারণায় পরিবর্তন ঘটে। মুদ্রণ-যন্ত্রও এমন একটি যন্ত্র, যার আলাদা সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। মুদ্রণ-যন্ত্র সমাজ পরিবর্তনে, জাতীয়তাবাদী চেতনা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান সর্বোপরি জ্ঞানচর্চায় মুদ্রণ-যন্ত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বলা যায়, মুদ্রণ-যন্ত্র আমাদের জীবন-যাপন-পদ্ধতির সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। মুদ্রণ-যন্ত্রকে ঘিরে আমাদের আলাদা একটি সংস্কৃতির বলয় তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ সমাজে মুদ্রণ-যন্ত্রকে ঘিরে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির দিকে যাত্রা শুরু করে। মুদ্রণ-যন্ত্র শুধু একটি যন্ত্র হিসেবে থাকেনি। সারা দুনিয়াতে মুদ্রণ-যন্ত্রকে ঘিরে মুদ্রণ সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে।

আমরা যদি ইউরোপের কথা ধরি, তাহলে দেখা যাবে মুদ্রণ-যন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে সেখানে মুদ্রিত বই পণ্য হিসেবে বিস্তার লাভ করে। মুদ্রণ-যন্ত্র পুঁজিবাদী একটি শক্ত ভিত হিসেবেও দাঁড় হয়। ইউরোপে পাণ্ডুলিপির জ্ঞান

ছিল দুর্লভ ও গোপনীয়, যেখানে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। কিন্তু মুদ্রণ-যন্ত্র আসায় এই জ্ঞান পুনরুৎপাদন ও প্রচারে সহজ হয়ে পড়ল। ফেবর ও মার্টিন এর মতে, ১৬০০ সালের মধ্যে ২০০,০০০,০০০ বই উৎপাদিত হয়েছে। যা আসলে পৃথিবীর অবস্থা বদলে দিয়েছিল।

শুরুর দিকে, পুঁজিবাদী উদ্যোগে বই ব্যবসায়ীরাও পুঁজিবাদী বাজারে প্রবেশ করে এবং তারাই সারা ইউরোপ জুড়ে বই প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করে, যার আসলে কোনো সীমানা ছিল না এবং ১৫০০-১৫৫০ সালে এটি ইউরোপে একটি পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। এক্ষেত্রে বই বিক্রেতারা যত বেশি বই বিক্রি করতে পারবে,ততই তাদের লাভ হবে। যদিও প্রথম দিকে বইয়ের বাজারটি শিক্ষিত ইউরোপীয় ও ল্যাটিন পাঠকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৬ শতকের দিকে ইউরোপের মোট জনগণের তুলনায় দ্বিভাষিক জনগণের পরিমাণ খুবই কম ছিল এবং একভাষী জনগণ বেশি ছিল। মুদ্রণ-যন্ত্রের সম্ভাব্য যে বাজার তা বোঝাই যাচ্ছিল একভাষী জনগণকে কেন্দ্র করে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ল্যাটিন প্রকাশনা সংস্কারের মধ্যে দিয়ে উত্থান ঘটলে, ১৭ শতকের মাঝামাঝি এই আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্যাথলিক লাইব্রেরি পরিপূর্ণ হয়। এই সময় ইউরোপ জুড়ে অর্থাভাবে প্রকাশকরা ফেরি করে স্বদেশীয় বই বিক্রি করত।

এসব ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উপাদান কাজ করেছে মুদ্রণ সংস্কৃতি তৈরির পেছনে। এই মুদ্রণ সংস্কৃতি আবার জাতীয়তাবাদের সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত। প্রথমত, গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ল্যাটিন ভাষার পরিবর্তন। এক্ষেত্রে খ্রিস্টপূর্ব সময়ে ছাপাখানার শ্রমিকরা যেসব প্রাচীনত্ব ছিল সেগুলো চমৎকার রচনাশৈলী দিয়ে বাস্তবময় মুদ্রণ জগতে নিয়ে আসে, ফলে তারা মধ্যযুগীয় চার্চের ল্যাটিন ভাষা থেকে পৃথক হলেও গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যময় হয়ে উঠে।
দ্বিতীয়ত দেখা যায়, ছাপখানার পুঁজিবাদী বিকাশের পিছনে কাজ করেছে সংস্কার। ১৫১৭ সালে মার্টিন লুথার যখন গুটেনবার্গ প্রেস থেকে বাইবেলের জার্মান অনুবাদ বের করেন; মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে তা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৫২২ থেকে ১৫৪৬-এর মধ্যে মোট ৪৩০টি সংস্করণ বের হয় এই অনুবাদটির। এই প্রথমবারের মত বিষয়টি বিশাল পাঠক সমাজের নজরে আসে। মার্টিন লুথারই প্রথম যে লেখকের নামে বই বিক্রি হয়।

মার্টিন লুথারের পর ছাপাখানা ব্যবসায়ীদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। প্রোটেস্টেন্ট ভাবাদর্শীরা আরো ব্যস্ত হয়ে পড়ে কীভাবে স্বদেশী প্রিন্ট মার্কেটগুলোকে আরো প্রসার করা যায়। যদিও কাজটা অতটা সহজ ছিল না, কেননা ১৫৩৫ সালে পোপরা কর্তৃত্ব খাটিয়ে একটি আইন তৈরি করে, যেখানে বলা হয় তাদের সংরক্ষণে রাখা কোনো পাণ্ডুলিপির প্রতিরূপ বা আংশিক ছাপানো হয়, তাহলে ফাঁসিতে ঝোলানো পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু ক্যালভিন'স জেনেভা যখন প্রোটেস্টানদের মধ্যে আরো সংস্কারবাদী হয়ে বাইবেল প্রকাশ করে, তখন সবার হাতে পৌঁছে যায় মুহূর্তেই, যার প্রায় ৮৪২ টা সম্পাদনা বের হয়। এবং সে সময়ে প্রায় ৪০টির মতো ছাপাখানা রাতদিন কাজ করে। সবমিলিয়ে দেখা যায় প্রোটেস্টানিজম ও মুদ্রণ-পুঁজিবাদ মিলে সহজ ও কম মূল্যের জনপ্রিয় পুস্তিকা বের করতে থাকে। যা আসলে নতুন এক ধরনের পাঠক তৈরি করে, যারা ল্যাটিন খুব অল্পই জানত অথবা জানত না। যদিও তারা ধর্মের রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিল। যেখানে চার্চে আর পূর্বের কর্তৃত্ব ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না এবং এই ছাপাখানাই ইউরোপে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটায়। পরবর্তী কালে ছাপাখানার প্রভাবে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতেও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। (Anderson, Benedict1991: 37-39)।

তৃতীয়ত দেখা যায় যে, স্বদেশীয় যে পুস্তিকাগুলো বের হতে থাকে তা শুধু এক ভূমিতেই প্রসার হয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা ছড়িয়ে পড়ে প্রশাসনিক বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি স্বৈরতন্ত্রের রাজাদের কাছেও। এবং এটাও মনে করিয়ে দেয় যে, মধ্যযুগীয় পশ্চিম ইউরোপে ল্যাটিন যেমনটা প্রভাব ফেলে তা পৃথিবীর অন্য জায়গায় সহজে তা সম্ভব না। ১২০০- ১৩৮২ সময়কার মধ্যে দেখা যায় রাষ্ট্রীয় ল্যাটিন ভাষার জায়গাটা দখল করতে থাকে নর্ম্যান ফ্রেঞ্চ, একই সময়ে শাসকদেও অধীনস্তরা অপ্রাতিষ্ঠানিক ইংরেজির দিকে অগ্রসর হল। এক্ষেত্রে যে ঘটনাটি ঘটে, ভাষা নির্বাচনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর মানুষ ভাষা নির্বাচন করে ক্রমাগত প্রায়োগিকতার মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকে দেখা যায়, শাসকদের সচেতন ভাষার রাজনীতির মুখোমুখি দাঁড়ায় জনপ্রিয় সাধারণ ভাষিক জাতীয়তাবাদ। কেননা, পুরনো প্রশাসনিক ভাষাটি শুধুই আমলাবর্গ, তাদের নিজেদের সুবিধা আদায়ের জন্যই ব্যবহার করত। শাসকরা জানত না

শোষিতদের উপর কীভাবে ভাষা আরোপ করতে হয়। শোষিতের যে ভাষা কাঠামো তৈরি হয়, তাই ল্যাটিন ভাষার প্রতিযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে, যেখানে কাল্পনিক খ্রিস্টীয় সমাজের পতনমুখীনতাও থাকে।

ছাপাখানা আসার আগে ইউরোপসহ পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় মৌখিক ভাষার যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, তা আসলে মানুষের জীবনধারণ ও যাপনের বৈচিত্র্যের কারণেই। আর মুদ্রণ পুঁজিবাদ এটাকে সম্ভাবনার চোখে বিচার করে, ফলে তারা এই বৈচিত্র্যকে সমবেত করে মুদ্রণ-ভাষা তৈরি করে বাজারে নিয়ে আসে।

পরবর্তী কালে, এই মুদ্রণ-ভাষাই জাতীয়তাবাদের চৈতন্যের ভিত তৈরি করে তিনটি উপায়ে। প্রথম ও প্রধান যে ভিত তা হল, তাঁরা একটি সমন্বিত ভাষা-কাঠামো তৈরি করে যেখানে ল্যাটিন ভাষা থেকে মৌখিক ভাষা গুরুত্বপূর্ণ হয়। যদিও বিশাল বৈচিত্র্য দেখা যায় মৌখিক ভাষার মধ্যে যেমন ফ্রেন্স, ইংলিশ ও স্প্যানিশরা। তবুও তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে মুদ্রিত পত্রিকা ও বইয়ের মাধ্যমে। তারা মুদ্রিত পত্র-পত্রিকা ও বইয়ের মাধ্যমে একে-অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে ওঠে অজান্তেই, যা আসলে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের জন্য সত্য। অর্থাৎ তারা জাতীয়ভাবে একটি কাল্পনিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।দ্বিতীয়ত, মুদ্রণ-পুঁজিবাদ (print-capitalism) ভাষার একটি সম্পূর্ণ নতুন কাঠামো তৈরি করে, যা আস্তে আস্তে রাষ্ট্রের ধারণা তৈরি করে। যা পরবর্তী শতকে স্থায়ী মুদ্রণ উপযোগী ভাষাতে পরিণত হয়। তৃতীয়ত, মুদ্রণ পুঁজিবাদ ভাষার ক্ষমতা তৈরি করে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, মুদ্রণযন্ত্রের ফলে যে ভাষা-কাঠামো তৈরি হয়েছে উপভাষাগুলোকে কেন্দ্র করে তারাই তাদের ব্যকরণগত ভাষা প্রকরণ (final froms) কে ছাপিয়ে যায়। সব মিলিয়ে বলা যায়, ইউরোপের জাতীয়তাবাদের যে সংস্কৃতি তৈরি হয়, তাতে মুদ্রণযন্ত্রের একটি প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে এবং পরবর্তী কালে রাষ্ট্র ধারণা তৈরির পেছনেও তার সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইউরোপের ন্যায় ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ বিকাশে রাষ্ট্রীয় ধারণা তৈরিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। এ অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের দানা বাঁধতে থাকে মূলত সংবাদপত্রের বিকাশকে কেন্দ্র করে। কেননা বৃটিশ রাজত্ব নানা শোষণ-বঞ্চনার বয়ান থাকতো ঐসব পত্রিকায়। এক্ষেত্রে কে. পি. সেন গুপ্তা তার 'The Introduction and Expansion of The Printing Press' প্রবন্ধে বলেন:

> The tracks Varied in Size from Pages to sixteen or more. There are mainly three types of track, written generally in Prose, but Sometimes in Verse also. First were the tracks containing polemic writings against the Indian religions, against caste system or other social customs.
>
> (Gupta, Kanti Prasanna Sen, 1971: 92)

অর্থাৎ মুদ্রণ-যন্ত্র ব্যবহার করার মাধ্যমে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের ও বইয়ের যে বিকাশ ঘটে, তা সমাজের মানুষের মতামত তৈরিতে এবং চিন্তার পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একসময় এটিই রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরি ও জাতীয়তাবাদী চেতনা তৈরিতে অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজ রূপান্তর ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় মুদ্রণ-সংস্কৃতির প্রভাব

উনিশ শতকের বাংলার সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মীয় ধারণাগুলোতে চিন্তার ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়। জ্ঞানচর্চা, চিন্তা ও যুক্তিচর্চা কুক্ষীগত করে রাখার মতো কোনো বিষয় আর থাকল না। যে কোনো ভালো কিংবা মন্দ চিন্তা মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে দেওয়া যেত । এই তথ্য ও চিন্তা ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে সমাজে ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় বড়ো একটা পরিবর্তন সাধিত হয়। আর এই রূপান্তর সম্ভব হয়েছে মুদ্রণ-যন্ত্রের কারণেই। যা ভাষা ও সাহিত্যে সমানভাবে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়।

সমাজ রূপান্তরে ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় মুদ্রণ-সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপক। ব্যাপকতার মাত্রা এতই তীব্র যে, মুদ্রণ-সংস্কৃতি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার পুরো ধারাটাই পরিবর্তন করে দিয়েছে। পরবর্তী দশকগুলোতে যা সমাজ রূপান্তরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। প্রথমেই আমরা দেখবো, শ্রুতি থেকে কীভাবে লিখিত ভাষার বিকাশ ঘটল এবং এই প্রক্রিয়াটি হঠাৎ করেই সম্পন্ন হয়নি।

মৌখিকভাবে চিন্তার প্রকাশভঙ্গি ও লিখিতভাবে চিন্তার প্রকাশভঙ্গি ভিন্নরকম। যদিও মনে করা হয় ভাষা একটি মৌখিক প্রপঞ্চ। আর মানুষ পরস্পরের সাথে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে যোগাযোগ করে থাকে তাদের নিজস্ব অনুভূতি

ব্যবহার করে। এগুলোর মধ্যে স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ ও দেখার মাধ্যমে হতে পারে। এমনকি শ্রবণশক্তি ব্যবহার করেও হতে পারে, তবে সবগুলোর মধ্যে মৌখিকভাবে যোগাযোগের সবচেয়ে উন্নত মাধ্যম হল অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ইঙ্গিত ভাষা। আর আমরা প্রত্যেকেই জানি, একটি ছবি হাজার হাজার শব্দের চেয়ে বেশি অর্থ বহন করতে পারে, তবে এক্ষেত্রে ছবিটির প্রসঙ্গ খুব জরুরি। এটা খুব স্বাভাবিক যে, যেখানে মানুষ বসবাস করে সেখানে একটি ভাষা থাকবে এবং ভাষাটি গড়ে ওঠে কথা ও শ্রুতির মাধ্যমে। এমনকি যারা জন্মগতভাবে বধির তারাও ইশারা ভাষার সাহায্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। পৃথিবীতে প্রায় দশহাজারের মতো ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই শ্রুতি-নির্ভর, মাত্র ১০৬ টি ভাষার লিখিত রূপ আছে। বর্তমানে প্রায় ৩,০০০ ভাষার অস্তিত্ব আছে। এর মধ্যে মাত্র ৭৮ টি ভাষায় লেখা হয়। তারা সাহিত্য রচনা করে এবং সংখ্যাও নেহাত কম নয় যে, অসংখ্য ভাষা এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে অন্য ভাষার সাথে মিশে, লিখিত ভাষারূপে আসার আগেই। বর্তমানে প্রায় ১০০ মতো ভাষা আছে, যেগুলো কখনোই লেখা হয় না, কেউ সেগুলো লেখার কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেনি। অর্থাৎ ভাষার একটি মৌলিক প্রকাশ হল শ্রুতি নির্ভরতা যা আসলে স্থায়ীভাবে প্রত্যক্ষ ভাষায়ই থাকে। (Ong, Walter J, 2000: 7-9)। কিন্তু পৃথিবীতে লেখার প্রচলন শুরু হলেও মৌখিক ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত। লিখিত টেক্সট কোনো না কোনোভাবে বাচিক ধ্বনির সাথে যুক্ত। এটা প্রকৃতিগতভাবেই তাদের ভিতর থেকে অর্থ তৈরি হয়। যদি কোনো টেক্সট জোরে পড়া হয়, তাহলে তা আওয়াজ এ পরিবর্তিত হয়, এবং যতবেশি পড়া হবে ততই কল্পিত জগত তৈরি হতে থাকবে। যুরিজ লটম্যান মনে করেন, ভাষার লিখিত রূপ হলো একটি 'সেকেন্ডারি মডেলিং সিস্টেম'। কিন্তু যা মূলত নির্ভর করে কথ্য ভাষার উপর এবং এটিকে তিনি বলেছেন 'প্রিয়র প্রাইমারি মডেলিং সিস্টেম'। মৌখিক ভাষার যে অস্তিত্ব তা লিখিত ভাষা ছাড়াও টিকতে পারে, কিন্তু লিখিত ভাষা মৌখিক ভাষা ছাড়া পারে না। পাশ্চাত্যে দেখা যায়, প্রাচীন গ্রীক থেকে শুরু করে পরবর্তী কালে তার বিস্তার বিভিন্ন জায়গায় হয়, সেখানে অলংকার শাস্ত্র নামে একটি বিষয় প্রায় দুই হাজার বছর ধরে পড়ানো হতো যাকে মূলত 'স্পীচ আর্ট' বলা হয়। যা 'ওরাল স্পিকিং' এর অধীনেই পড়ে। অন্যদিকে অ্যারিস্টটলের *আর্ট অফ রিটোরিক* যদিও লিখিত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু এটি একটি বক্তৃতা সংকলন। অর্থাৎ আক্ষরিক লিপিগত যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে তা মূলত কথ্য ভাষা থেকেই এসেছে। তবে এটাও সত্য যে, প্রতিলিপি তৈরির মাধ্যমে যে মৌখিক ভাষার রূপ তৈরি হয় সবসময় এমন নয়, লিখিত ভাষা মাঝে মাঝে লিখিত ভাষার ভিতর থেকেও তৈরি হতে পারে। এমনকি লিখিত ভাষা টেক্সটে মনোযোগী করে তুলতেও পারে, যেখানে নীরবে পাঠ করাই মুখ্য হবে।

কোহেন (১৯৭৭) মনে করেন, ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই মৌখিক ভাষার সাথে লিখিত ভাষার একটি জটিল ও দুর্বোধ্য সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু টেক্সট এর ভাষা ক্রমাগত মৌখিক ভাষাকে অধীনস্ত করে যাচ্ছে। লিখিত ভাষায় 'ওরাল আর্ট ফরম' ব্যবহার করা হলেও সেখানে কোন তথ্য নির্দেশিকা থাকে না। লিখিত ভাষা তৈরি হওয়ার প্রায় ১০ হাজার বছর আগেই মৌখিক ভাষা উন্নতি লাভ করে। যার সাথে লিখিত ভাষার কোনো সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু আমরা যখন 'সাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করি তখন শুধু লিখিত ভাষার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করে থাকি, যেমন ইংরেজি সাহিত্য, শিশু সাহিত্য কিন্তু মৌখিকভাষার ক্ষেত্রে তেমনটি নেই। এমনকি যেগুলো শ্রুতি-নির্ভর ঐতিহ্য রয়েছে, যেমন, কথ্য গল্প, প্রবাদ প্রবচন, প্রার্থনা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও আমরা কিছুই ব্যবহার করি না। শ্রুতি মূলত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন লিখিত বা মুদ্রণ জ্ঞানের সাথে বিশেষত প্রাইমারি ওরালিটি। কিন্তু এখন এক ধরনের সেকেন্ডারি ওরালিটি তৈরি হয়েছে, যেখানে প্রযুক্তিগত ব্যবহার রয়েছে। যেমন, টেলিফোন আলাপ, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি। বর্তমানে প্রাইমারি ওরালিটি খুব কমই অস্তিত্বশীল, যেখানে লিখিতভাষার মাধ্যমে তাদের আবেগ, অনুভূতি প্রকাশ করা হয়। (Ong, Walter J, 2000: 133-134)। যদিও মৌখিক ভাষাকে যখন শব্দ দিয়ে লিখিত হয়, তখন নিদারুণভাবে দৃশ্যমান যে অস্তিত্ব থাকে তা প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। যেমন কোনো শিক্ষিত লোককে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'নেভারথেলেন' নিয়ে চিন্তা করতে, তারা আসলে কোনো কল্পচিত্র তৈরি করতে পারবে না। অর্থাৎ মৌখিক ভাষা ব্যবহারকারী যেমন ধ্বনিময়তা, কল্পচিত্র চিন্তা করতে পারে, তা একজন শিক্ষিত মানুষের পক্ষে ভাবা কখনোই সম্ভব নয়। অন্যদিকে মৌখিক ভাষার ঐতিহ্য, কর্মক্ষমতা ও রীতিকে অনেকেই 'সাহিত্য' বলে অভিহিত করেছেন। যা আসলে হুইল ছাড়া একটি গাড়ির সাথেই কল্পনা করা যায়। তবে লিখিত ভাষার আধিপত্যের কারণে কল্পনা করা, কল্পচিত্র তৈরি করা তা অনেকাংশেই কঠিন

হয়ে পড়েছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের যুগে, অভিধান যে কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, ভাষার প্রতি নিয়ম আরোপ, বানান সতর্কতা এসব কারণে এখন খুব কম ভাষাই আছে যে এই প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছে না। তবে এটাও সত্য যে, মানুষ তার সত্যিকার সম্ভাবনার দিকে যেতে পারবে না লিখিতভাষার ব্যবহার না করে। অর্থাৎ লিখিত ভাষাকে খেয়াল রাখতে হবে, পূর্বে নির্দিষ্ট মৌখিক ভাষার ধরনের উপর। সাহিত্যের উন্নতি বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, দর্শনে কিংবা যেকোন শিল্পের হতে পারে, সেক্ষেত্রে মৌখিক ভাষার যুক্ততার মধ্য দিয়ে তা সম্ভব হয়। মৌখিক ভাষা ও লিখিত ভাষার যেসকল বৈশিষ্টের ভিত্তিতে বর্তমানে তৈরি হয়ে আধুনিক ভাষা এদের মধ্যে কিছু লক্ষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, মৌখিক ভাষা মূলত নির্ভরশীল নয়, যতটা না ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে যুক্ততা তৈরি করে। মৌখিক ভাষার যে বয়ানধর্মিতা তা লিখিত ভাষা থেকে অনেক পৃথক। মৌখিক ভাষা থেকে ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লিখিত ভাষা তৈরি হয়েছে। যেমন- *দ্যি ডোনে ভার্সন* (১৬১০) এ যে ওরাল প্যাটার্নিং রয়েছে তা ১৯৭০ সালে নতুন আমেরিকান বাইবেল এ ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

> In the beginning God created heaven and earth. And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep and the Spirit of God moved over the waters. And God Said: Be light made. And light was made. And God saw the light that it was good; and he divided the light from the darkness. And he called the light Day; and the darkness Night; and there was evening and morning one day.
>
> (Ong, Walter J.,2000: 37)

এখানে দেখা যায় 'and' এর ব্যবহার যে বাক্যরীতিতে লেখা হয়েছে, তা আমূল পরিবর্তিত হয়েছে-

> In the beginning, when God created heaven and the earth, the earth was a former, and darkness covered the abyss, while a mighty wind swept over the waters. Then God Said, 'Let there be light and there was light from the darkness. God called the light 'day' and the darkness he called 'night'. Thus, evening and morning folled the first day.
>
> (Ong, Walter J.,2000: 37)

আবার, মৌখিক ভাষা লিখিত ভাষা থেকে আরেকটা জায়গায় পৃথক। মৌখিক ভাষা কাঠামোগতভাবে স্মৃতি রক্ষা করে চলে, এক্ষেত্রে সমস্ত বিষয় তাকে মনে রাখার জন্য ক্রমাগত বিশেষণ ও শব্দমিলের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়, যেটাকে একান্তই অপ্রয়োজনীয় ও কষ্টকর মনে করা হয়। মৌখিক ভাষা থেকে লিখিত ভাষায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো বাড়তি বা পূর্ণবার করে বলা। কেননা যখন লিখিত ভাষা পড়া হয়, তখন যেকোনো সময় চাইলেই আগের লাইন পড়া যায়। কিন্তু মৌখিক ভাষায় দেখা যায় শ্রোতার সাথে সাথে তাল মেলাতে হয়। তবে পূর্ণবার বলার ক্ষেত্রে মৌখিক ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পায়। যখন মৌখিক ভাষায় কোনো বয়ান দেওয়া হয়, তখন শ্রোতারা ঐ বয়ানের সাথে সাথে চিন্তার বিস্তার ঘটাতে থাকে। ফলে যদি কিছু না শুনে থাকে বা খেয়াল না করে থাকে অথবা ধরতে না পারে সেক্ষেত্রে পূর্ণবার বলাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য মৌখিক ভাষাতে একই বাক্য পুনর্বার বলার রেওয়াজ আছে। অপরদিকে লিখিত ভাষায় চিন্তার সাথে সাথে বয়ানের কোনো সম্পর্ক না থাকায় এটি নষ্ট হয়ে গেছে। আবার মৌখিক ভাষার উপর ভিত্তি করে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত, সেখানে যে জ্ঞানচর্চা হয় তা অনেকবেশি শ্রমসাধ্য হয়ে থাকে। কারণ এই জ্ঞানচর্চা স্মৃতির সাথে সম্পর্কিত। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় ঐ সমাজে যাদের বয়স যতবেশি, তার জ্ঞানী হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কারণ সে প্রচলিত কিংবা ঐতিহ্যিক যে সংস্কৃতি আছে সেখানে অনুপ্রবেশের সুযোগ যার বয়স বেশি সে বেশি পেয়ে থাকে। মৌখিকভাষাতে আরেকটি বৈশিষ্ট্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো মৌখিকভাষা অনেক বেশি জীবন ঘনিষ্ঠ। যেখানে লিখিতভাষা অতটা জীবন্ত নয়। কেননা লিখিতভাষার যে চিন্তার প্রকাশভঙ্গি হয়, তা হয় কাঠামো কেন্দ্র করে এবং মৌখিক ভাষার যে জ্ঞানের বিস্তার হয় তা জীবন ও চারপাশের সমন্বয়ের মাধ্যমে। আবার এটাও সত্য যে, মৌখিক ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা বয়ানের ক্ষেত্রে বর্তমান জীবন-যাপনকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখে। কিন্তু মুদ্রণ-সংস্কৃতিতে বা লিখিত ভাষায় শব্দগত যে অর্থ হয়, তা অনেক সময় অপরিচিত হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের অভিধান ব্যবহার করতে হয়। যেখানে পাশাপাশি কিছু শব্দের অর্থ সমার্থে ব্যবহার করলেও পরিস্থিতি অনুসারে বিচার করলে দেখা যায়, এগুলোতে অর্থের অনৈক্য রয়েছে। মৌখিকভাষার ক্ষেত্রে সরাসরি ভাষার অর্থ আসে অঙ্গভঙ্গি, গলার স্বর,

মৌখিক অভিব্যক্তি প্রভৃতির সমন্বয়ে। যা অনেক বেশি বাস্তবিক হয়ে ওঠে, কিন্তু লিখিত ভাষার এই সুযোগটা নেই বললেই চলে।

এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, শুধু যে মৌখিক ভাষা থেকে লিখিত ভাষায় আসার ক্ষেত্রেই সমাজের একধরনের বড়ো পরিবর্তন সাধিত হয়। তারপর তা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায়ও প্রভাব বিস্তার করে। আমরা যদি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রণীত বাংলা ভাষার আধিপত্যের কথা ধরি, তা হলে দেখব সেটা কীভাবে সমাজের সাহিত্য ও ভাষার মান সংস্কারে ভূমিকা রেখেছিল। যা আসলে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার আমূল পরিবর্তন করে। বাংলা ভাষাকে যখন ছাপাখানার মাধ্যমে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রমিতকরণের চেষ্টা চালায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও মিশনারিজরা, তাতে বিভিন্ন স্কুল, বুক সোসাইটির সাহিত্য সংঘ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। একথাও সত্য যে, তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তাদের লেখনী এমনকি পত্রিকাতেও লিখতে চেষ্টা করত ইংরেজির আদলে। এবং বুদ্ধিজীবীরা ভাষার কাঠামো, রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন সবই অন্ধ অনুকরণের দিকে ঝুঁকে পড়ল। শুরুর দিকে আস্তে আস্তে এ পরিবর্তন হলেও, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা চাইত উপনিবেশ-পূর্ব সাহিত্যের সংস্কার করে নতুন সাহিত্যের ভাষ্য তৈরি করার। যদিও এর বিপরীতে আমরা দেখি বটতলায় ছাপার বইয়ের বিশাল বাজার তৈরি হয়। কিন্তু ১৮৫৬ সালে এই বইগুলির উপর অশ্লীলতার অভিযোগ এসে ছাপা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখানকার বুদ্ধিজীবীদের দ্বিভাষিক মনোভাব তৈরি হলো, যেখানে পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শ গুরুত্ব পায়। (Ghosh, Anindita 2006: 66-68)। বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মোটাদাগে যে কয়টি বিষয় আলোচিত, তার মধ্যে একটি হলো ভাষার প্রমিতকরণ ও আদর্শ মান নির্ধারণ। ঐ সময়ে *সমাচার চন্দ্রিকা* পত্রিকা এবং হিন্দু প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত গান্দিয়া সমাজ, ধর্ম সভা যাদের দিয়ে প্রতিষ্ঠা পায় তারা অধিকাংশই গ্রামের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিল, যে কারণে শহরে এসেও ব্রাহ্মিক বিশ্বাস ও সংস্কৃত অনুরাগ পুরোপুরি থাকায়, তারা যে ভাষা এবং ভাষার প্রমিতমান নির্ধারণ করলেন তা অনেকটাই শাস্ত্রাধীন। অন্যদিকে দেখা যায়, এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাদের শাস্ত্র অনুযায়ী ভাষা তৈরি করতে থাকে, যা আসলে সংস্কৃতি নির্ভর। এক্ষেত্রে গ্রামীণ মানুষজন উদ্বিগ্ন হতে থাকে তথাকথিত ভদ্রলোক দ্বারা নির্মিত বাংলা ভাষা দেখে যা আসলে তারা কখনোই ভাবেনি। সংস্কৃত পণ্ডিতরা এটি করতে পারবে এবং তারা এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, তারা যে ভাষা তৈরি করছে তা-ই আসলে বাংলা মৌখিক ভাষা হওয়া উচিৎ। যা আসলে সাধু ভাষার ইঙ্গিত প্রদান করে। এই সময়কালে দেখা যায় যে, ভাষার দু ধরনের সংস্কৃতি তৈরি হয়। প্রথমত, শিক্ষিত মানুষজন যারা আসলে সংস্কৃত, ফার্সি, ইংরেজি, বাংলা এর সবগুলোই প্রয়োজনীয় ব্যবহার করতে জানে। অন্যদিকে যারা শুধু স্বদেশি মৌখিক ভাষাই ব্যবহার করে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৭৭৮ সালে এন বি হালহেড যে বাঙলা ব্যাকরণ রচনা করেন, তা বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাষা থেকেই উদ্ভূত। ফলে তা শিক্ষিত শ্রেণির ব্যাকরণ হিসেবেই বিবেচিত। তার সময়কালে এই ব্যাকরণ বই শিক্ষার প্রমিত মান নির্ধারক হয়ে ওঠে। যদিও বইটিতে জোর দেওয়া হয়েছিল বানান, ব্যাকরণ ও শব্দ সম্ভার হিসেবে।

১৮৩৫ সালের দিকে উইলিয়াম এডাম, স্টেট অফ এডুকেশন রিপোর্টে এখানকার শিক্ষার দুরবস্থা নিয়ে শোক প্রকাশ করেন। তিনি এ অভিযোগও করেন যে, বাংলা শিক্ষাব্যবস্থায় মৌলিক সত্য ও মানবিক জ্ঞান খুবই সীমিত। এ অবস্থায় ১৭৮৪ থেকে ১৮০৯ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরীজীবী পণ্ডিত যোনাথান ডানকান, হেনরি পিটস্ ফরস্টার এবং নীল বেনযামিন কোম্পানির টাকায় কিছু বই বের করে বাংলা প্রমিতকরণের উদ্দেশ্যে, যার মূল ছিল সংস্কৃত ভাষা।

এই প্রক্রিয়ায় যখন গদ্যরীতি তৈরি হল, সেখানে প্রচুর পরিমাণ সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার ছিল। এই শব্দগুলোকে বলা হয় তৎসম। এই গদ্যরীতির নাম হয় সাধু ভাষা। অন্যদিকে সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত শব্দ, ফার্সি, আরবি এদের সমন্বয়ে যে নিয়মিত শব্দসম্ভার তৈরি হয় তাকে বিকৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং বাংলা প্রমিতকরণের বাধা হিসেবে দেখানো হয়। যার নাম হয় তদ্ভব শব্দ। এই তদ্ভব শব্দ থেকেই চলিত ভাষার তৈরি হয়। এই চলিত ভাষাই সাধারণ মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হয়, আর সাধু ভাষা হয় টেক্সট নির্ভর। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়'র মতে, বাংলা গদ্যরীতিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল যতিচিহ্নের ব্যবহার, যা আসলে পাশ্চাত্য ভাষার নিয়মানুসারে আরোপ করা হয়। পরবর্তী কালে আমরা দেখবো, ১৮০০ সাল থেকে প্রমাণ এই গদ্যরীতি চালু করার পিছনে দুটি প্রতিষ্ঠানের

ভূমিকা অনেক বেশি, ব্যাপটিস্ট এট শ্রীরামপুর এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। উইলিয়াম কেরি ছিল কলেজের বাঙলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই প্রথম সেরামপুর প্রেস থেকে বাংলা গদ্যের, ব্যাকরণ ও অভিধান বের করে। পরবর্তীতে ছাপাখানার মাধ্যমে বিভিন্ন টেক্সট বইও বের করে- যা 'স্কুল বুক সোসাইটি' অনুমোদন করে। এভাবেই একটি সংস্কৃতঘেঁষা গদ্যরীতি চালু হয়ে বিস্তার লাভ করে।

তারপর, এই ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা আমাদের এ অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্যকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করে এবং সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে ভিক্টোরিয়ান মোরালিটি অনুকরণ করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে অশ্লীল ও অসভ্য এই ধারণা পোষণ করার কারণে তারা এই পরিবর্তন চাইত। এই সংস্কার করার জন্য যে পদ্ধতি তারা অবলম্বন করল তা হল বিভিন্ন পত্রিকা, শহরে বিভিন্ন সংগঠনের মিটিং এবং বিভিন্ন সাহিত্য সংঘ ও সভার মাধ্যমে। যেমন, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বৃটিশ পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদরা বাংলাতে আসে, তখন তাদের বড় একটি উদ্দেশ্য ছিল তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে এখানে পরিচয় করে দেওয়া। ফলে তারা ক্রিশ্চিয়ান যে রক্ষণশীল সংস্কৃতি তাই এখানে আরোপ করল এবং তাদেরই শিক্ষা কারিকুলাম এখানকার মানুষদের জন্য নিয়ে আসল।

১৮১৪ সালের দিকে এই কারিকুলাম তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থমাস থমসন। যিনি 'চার্লিস গ্রান্ট টু দ্যা কোর্ট অফ ডিরেকটরস' ছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন বাংলা ভাষা ও শিক্ষার ব্যাপারে। তিনি নৈতিক শিক্ষা চালু করেন। অন্যদিকে যশোয়া মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনারিতে অক্ষরজ্ঞান হলেই তাদেরকে ইতিহাস, নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা পড়ানো হত। মিশনারির অধীনে যে স্কুলগুলো পরিচালিত হতো তাতে শিক্ষা পদ্ধতির এই নির্দেশনাগুলো আরো জোরালো ছিল। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে বের হল 'রেভারেন্ড স্টুয়ার্টস উপদেশ কথা অর ওয়ার্ডস অফ এডভাইস', যা কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি বের করে। এবং ১৮২০ সালের দিকে এই বুক সোসাইটি আরেকটি জীবনীগ্রন্থ বের করে সিসেরো, অ্যারিস্টটল এবং সেজার এর। তাদের জীবনীগ্রন্থ বের করার ভেতর দিয়ে তারা জীবনের মানবিক মহৎ গুণ প্রকাশ করে এবং কীভাবে জীবনের উন্নতি সাধিত হয়। যারা শিক্ষানবীশ ছিলেন, তাদেরকে রীতিমত বাধ্য করা হত তাদের আরোপিত পদ্ধতিতে শিক্ষা নিতে, চিন্তা করতে। এবং বলা হত শিক্ষা অর্জনের জন্য এটাই সঠিক পদ্ধতি ও ভাষা জ্ঞান। (Ghosh, Anindita 2006: 80-82)। তারা শিশুদের দুই শ্রেণীর বই দিত, ক) তথ্যপূর্ণ বই, খ) শিক্ষামূলক বই। তথ্যপূর্ণ বইগুলোতে দেখা যেত বিভিন্ন পশু-পাখি সম্পর্কে তথ্য থাকত, যেমন- কুকুর খুব বিশ্বস্ত প্রাণী, ঘোড়া খুব দ্রুতগামী প্রাণী ইত্যাদি। অন্যদিকে শিক্ষামূলক বইগুলোতে থাকতো ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, পাঠশালায় ঠিক সময়ে আসা, ভালো মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করা ইত্যাদি। আমরা যদি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) *বর্ণ পরিচয়* বইগুলো দেখি, তাতে দেখা যাবে এই বইগুলোর নকশা, ভাবনা ছিল কোনো ইংলিশ মডেল স্কুলের। *বর্ণ পরিচয়* ১৮৫৫ সালে প্রথম প্রকাশ পায়। এই *বর্ণ পরিচয়* এখনো বিভিন্ন স্কুলে পড়ানো হয়।

মিশনারি থেকে আরেকটি বিষয় ব্যাপক অর্থে সমালোচিত হল। এখানকার গ্রামীণ মৌখিক রীতিযুক্ত নাটক, কবিতা, গান ছিল। যেমন এ অঞ্চলে খুবই লক্ষ্যণীয় ছিল যাত্রাপালা, কীর্তন ও কবিগান। এছাড়াও ছিল খেমটা ও ঝুমুর। প্রেমের গান ছিল রাধা কৃষ্ণকে নিয়ে। এই রীতিগুলোর প্রকাশভঙ্গি খোলামেলা ও সমসাময়িক রসবোধেপূর্ণ ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই রীতিগুলোর সাথে এই অঞ্চলের মানুষ অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু প্রশাসনিকভাবে ও মিশনারি থেকে বলা হলো এই সামাজিক রীতিগুলো সংস্কার প্রয়োজন এবং তা কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ। তারা কলকাতার বিভিন্ন বইয়ের দোকানে তল্লাশি করে লোক সাহিত্যের অজস্র প্রেস ও বই অশ্লীলতার নামে নষ্ট করে ফেলে এবং তাদের মতে, তাঁরা বাংলা সাহিত্যের আধুনিকায়নে কাজ করে।

তারপর দেখা যায়, সাহিত্যের যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। নতুন নতুন মতাদর্শ, চিন্তা, ভাবনা এর সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নতুন একটি আকৃতি নেয়। ছাপাখানার মাধ্যমে যে বাঙালি সংস্কৃতির প্রসার ঘটছিল (বটতলা, পাঞ্চালী, প্রহসন, কবিগান) তার উপর যে অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়, তাতে করে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তই বেশি সমর্থন করে। তারা তখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভিক্টোরিয়ান ধ্যান-ধারণাকে শুদ্ধ এবং উচ্চমানের ভেবে অন্ধ অনুসরণ করত। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এ কাতারে

অগ্রগণ্য হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি সংস্কারবাদীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ঐ সময় *বঙ্গদর্শন* নামে যে পত্রিকা বের হতো তার সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তখন তারা পাশ্চাত্য চিন্তার আলোকে সাহিত্যকে পরিমার্জিত করে এবং শিক্ষিত পাঠকদের রুচিশীল করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকাতে তৎকালীন সময়ে যেসকল সমালোচনা বের হতো তাতেও প্রভাব বিস্তার করতো, বিশেষ করে শহুরে মধ্যবিত্ত'র কাছে। রাধানাথ বর্ধনের *সরোজিনী* নাটক সম্পর্কে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকাতে লেখা হয় ইতর, নিম্নশ্রেণীর, মেয়েলী বয়ানে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং এটাও বলা হয়েছে, এটা লজ্জাজনক। অতএব ভদ্রলোকের সাহিত্য বলতে তখন যে চিত্র পাওয়া যায়, তা হলো ঔপনিবেশিক চিন্তা-প্রসূত সাহিত্য আর অন্যসব হলো স্থূল ও গ্রাম্য, যা ভদ্রলোকের সংস্কৃতি হতে পারে না। ১৮৭৩ সালে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকাতে বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রবন্ধ লেখেন 'অশ্লীলতা' নামে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, অল্প শিক্ষিত লোকজন দিয়ে কখনো ভদ্র সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না এবং তারা যা রচনা করবে তাই নিম্নশ্রেণীর সাহিত্য হবে।

১৮৩০ সাল পরবর্তী সময় খেয়াল করলে দেখা যায়, এই সময়কালে প্রচুর পত্র-পত্রিকা, সাহিত্য সংঘের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এগুলোর মধ্যে প্রভাব বিস্তারকারী একটি সভার নাম 'তত্ত্ববোধনী সভা'। এটি ১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, বাংলা ভাষা সাহিত্যের উন্নতির লক্ষ্যে। এই সভা থেকে যে পত্রিকাটি বের হয় তার নাম *তত্ত্ববোধনী*। যেখানে সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও জীবনী ইত্যাদি প্রকাশ এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদও বের হতো। এছাড়াও বিভিন্ন বেঙ্গল লিটারেরি সোসাইটি যেসকল অনুবাদ বের করত এগুলোর মধ্যে রবিনসন ক্রুসো, ল্যাম্বস টেল, ঈসপ টেল ইত্যাদি। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রাচ্যের যেসকল পণ্ডিত ছিল এদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখার্জি, রসময় দত্ত। এরা মূলত খুশিমনে লর্ড ডালহৌসির ব্যবস্থাপনাকে সমর্থন করে।

অন্যদিকে, অশ্লীলতা নিয়ে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এতটাই সমালোচনা করল যে, সাহিত্যের মধ্যে এটি একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করল। এমনকি ঐ সময় 'ঝুমুরওয়ালী' নৃত্য, পাঞ্চালী গীত যেগুলো নারীমহলে সারা বাংলায় জনপ্রিয় ছিল, সেগুলো প্রতিরোধ করার জন্যও শিক্ষিত ভদ্রলোকরা আক্রমণ শুরু করে। *বিদ্যাসুন্দর* নামে গল্পের বই বের হতো, তাতে তারা ধারণা করা শুরু করলো যে মেয়েদের সুন্দর অনুভূতিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। এটা আরো স্পষ্ট হয় তত্ত্ববোধনী পত্রিকা উদ্দেশ্য পড়লে। সেখানে বলা হয়:

> The main aim of female education is to train, improve and nourish the gentle and noble qualities of her heart… So that women can become tender hearted, affectionate, compassionate. (Ghosh, Anindita 2006: 99).

তবে এটাও লক্ষ্যনীয় ব্যাপার যে, বৃটিশরা বলে এখানকার সাহিত্য যৌনাকর্ষক ও অশ্লীল। কিন্তু উপনিবেশের আগেও এ অঞ্চলে সাহিত্যচর্চার ইতিহাস আছে। সেখানে দেখা যায়, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনি ও একটি পুরানের অংশ। দেবতার তুষ্টি অর্জনের জন্য আরাধনা করা হতো, বিভিন্ন রোগশোক থেকে মুক্তির জন্য এবং সেখানে শরীর থেকে ইন্দ্রিয়গত ব্যাপারই বেশি ছিল। তবে, পাঞ্চালীগুলোতে দেখা যেতো তুলনামূলক যে কাব্যগুণ প্রকাশ পেতো, তাতে ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা এবং আলংকারিক দক্ষতা ছিল। অর্থাৎ পরবর্তী সময়কালে ধ্রুপদী সঙ্গীতের ও শাস্ত্রিক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা কোনো আচারনিষ্ঠ যৌনতার সাথে যুক্ত ছিলে না।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষের সমাজ রুপান্তর ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় মুদ্রণ সংস্কৃতি বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই অঞ্চলের ভাষার নির্মাণ বিশেষত গদ্যের বিকাশ এবং জ্ঞানের প্রসার, জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ও রাজনৈতিক চিন্তা চর্চাসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুদ্রণ যন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে ভারতবর্ষে মুদ্রণ যন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের শাসনামলে, তাই শাসকদের অভিরুচি অনুযায়ী ছাপাখানাকে ব্যবহার করে সমাজের স্বাভাবিক ও চলমান স্বতস্ফূর্ত ভাষা ও সাহিত্যের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এবং তারা মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশ তৈরির লক্ষ্যে আধিপত্য বিস্তার শুরু করে ভাষা ও সাহিত্যের উপর। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শাসকরা তাদের সুবিধার্থে প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় ভাষার পরিবর্তনমুখী নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে। এই পরিবর্তন

স্থায়ী ও সচিত্র রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রণ-যন্ত্রই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এছাড়াও ঊনিশ শতকের গোড়া থেকে যেসকল পত্রিকা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, ছাপাখানার প্রত্যক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে তাই বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় এক বিরাট পরিবর্তন সাধন করে। এ বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ক্ষমতাসীনদের অধীনস্ততায় প্রভাবিত প্রায়ই, তবুও যে সংস্কার ঘটেছে, তা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে সর্বোপরি রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। অর্থাৎ বর্তমান গবেষনায়, এই অঞ্চলে কীভাবে ভাষা, সাহিত্য ও চিন্তা একটি যন্ত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে সেটার স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১। আনিসুজ্জামান (২০১৪), 'অষ্টাদশ শতাব্দীর কিছু বাংলা চিঠিপত্র', *ভাষা-সাহিত্যপত্র*, (সম্পাদক: অধ্যাপক ড. অনিরুদ্ধ কাহালি), বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

২। আজম, মো. (২০১৪), *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, আদর্শ, ঢাকা

৩। (২০১৪), 'বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন: ইংরেজ ও ইংরেজির প্রভাব', *ভাষা-সাহিত্য পত্র*, (সম্পাদক: অধ্যাপক ড. অনিরুদ্ধ কাহালি), বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

৪। খাস্তগীর, আ. (২০০৭), 'উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের বাজার', *মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই*, (সম্পাদক : স্বপন চক্রবর্তী), অবভাস, কলকাতা

৫। গুপ্ত, অ. (২০০৭), 'ভারতবর্ষের গ্রন্থেতিহাস: কিছু মৌল সমস্যা', *মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই*, (সম্পাদক : স্বপন চক্রবর্তী), অবভাস, কলকাতা

৬। চক্রবর্তী, শ্রী. প্র. (১৯৮৩), *আধুনিক ভারত*, প্রথম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা
দাশ, শি. কু. (১৯৯২), *ভাষা জিজ্ঞাসা*, প্যাপিরাস, কলকাতা

৭। বিশ্বাস, অ. (২০০০), 'ভূমিকা', *বটতলার বই*, (সম্পাদক: অদ্রীশ বিশ্বাস), গাঙচিল, কলকাতা

৮। মুরশিদ, গো. (২০০৯), *আঠারো শতকের গদ্য*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

৯। ... ... (১৩৯৯), *কালান্তরে বাংলা গদ্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

১০। রাব্বী, ফ. (১৯৭৭), *ছাপাখানার ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১১। রায়, দে. (১৯৭৮), *রবীন্দ্রনাথ ও তার আদি গদ্য*, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা

১২। ... ... (১৯৯০), *উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা

১৩। সরকার, প. (১৪১২), *ভাষা দেশ কাল*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা

১৪। শ্রীপান্ত (১৯৭৭), *যখন ছাপাখানা এলো*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

১৫। Anderson, B. (1991), *Imagined Communities: reflections on the Origin and Nationalism*, Verso, USA.

১৬। Ghosh, A. (2006), *Power in Print*, Oxford University Press, New Delhi.

১৭। Gupta, K. P. S. (1971), *The Christian Missionaries in Bengal (1793-1833)*, Diania Press, Calcutta.

১৮। Ong, W. J. (2000), "Orality and Literacy" Routledge, 270 Madison Ave, New York.

১৯। Roy, T. (1995), "Disciplining the Printed Text: Colonial and Nationalist Surveillance of Bengali Literature", *Texts of Power*, Edited by Partha Chatterjee, University of Minnesota Press, Minneapolis London

২০। Shaw, G. (1976), *Printing in Calcutta to 1800, Oxford* University Press, New York.